RAY: International Journal of Multidisciplinary Studies, E-ISSN: 2456-3064
Volume III, No. 2, October, 2018, pp. 71-76.

ভারতের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে সম্প্রীতির উদাহরণ

Kamal Saha
Department of History,
Pritilata Waddedar Mahavidyalaya
Nadia, India.
kamalsaha533@gmail.com

কথাবস্তুর কাঠামো (Structure Abstract):

উদ্দেশ্য (Purpose): সময়টা ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দ, ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা অনুযায়ী অন্তবর্তী সরকার গঠনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ সহমতে আসতে ব্যার্থ হয়। ফল স্বরুপ লীগনেতা মহম্মদ আলি জিন্নার ডাকে ১৬ই আগষ্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম (Direct Action) পালিত হয়। ঐ দিন কলকাতাসহ বাংলা তথা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়।

পদ্ধতি / প্রকরণ (Methodology): একই সময় বাংলায় চলমান তেভাগা আন্দোলন কার্যত সাম্প্রদায়িকতামুক্ত। বাংলার প্রাদেশিক কৃষকসভা পরিচালিত এই আন্দোলন ছিল কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার আন্দোলন । দাঙ্গার পটভূমিতে তেভাগা আন্দোলন ছিল সম্প্রীতির উদাহারন। (ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে বর্গাদার কৃষকরা উৎপন্ন ফসলের আধাভাগের পরিবর্তে তিনভাগের দুইভাগ পাওয়ার দাবীতে আন্দোলন শুরু করে)।

উপপদ (Findings): তেভাগা আন্দোলনে জোতদার-জমিদার-কংগ্রেস ও লীগ ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাকে শ্রেনীগত অস্ত্র হিসাবে কৃষকদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। অন্যদিকে কৃষকসভার নেতৃত্বে আধিয়ার-বর্গাদার কৃষকরা হিন্দু-মুসলীম নির্বিশেষে সম্পীতি বজায় রেখে জোতদারদের ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করেছিল এটাই ছিল দাঙ্গার প্রেক্ষিতে তেভাগা আন্দোলনের সাফল্য।

Type of Paper: বিশ্লেষণমূলক (**Analytical**)।

মূল শব্দগুচ্ছ / পাদটিকা (Keywords): সম্প্রদায়, সাম্প্রদায়িকতা, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উত্থান, তেভাগা আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি।

সমস্বার্থ বিশিষ্ট কোন জনসমষ্টি যখন জাতি, ধর্ম, ভাষা, জীবিকা বা ধর্মের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়, তখন সেই জনসমষ্টিকে সম্প্রদায় বলে। যেমন ইহুদি সম্প্রদায়,শিক্ষক সম্প্রদায়, হিন্দু সম্প্রদায়, মুসলিম সম্প্রদায় ইত্যাদি। আর সাম্প্রদায়িকতা হল বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্দেহ, ভীতি ও বিদ্বেষের যে পরিবেশ

বিরাজ করে তা হল সাম্প্রদায়িকতা। ভারতের প্রেক্ষাপটে সাম্প্রদায়িকতা হল হিন্দু-মুসলমানের প্রকাশ্য সংঘাত। সাম্প্রদায়িকতা হল একটি মতাদর্শ যা প্রত্যেক ধর্মের অনুগামী গোষ্ঠীকে একটি সামাজিক,রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক একক হিসাবে গন্য করে। ডঃ বিপান চন্দ্রের মতে , যখন কোন জনগোষ্ঠী মনে করে যে, তারা যেহেতু একটি বিশেষ ধর্মের অনুগামী, সেইজন্য তাদের একটি সাধারন সামাজিক,রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ আছে, তখন তাকে বলে সাম্প্রদায়িকতা।

ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার সময় থেকে হিন্দু-মুসলিম ধর্মভিত্তিক শ্রেনীবিভাগ ভারতীয়দের মধ্যে এক বিভাজনের রেখা অঙ্কন করে। মুসলিম শাসনের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে এবং হিন্দু সমাজের বর্ন-বৈষম্যের চাপে নিম্ন বর্নের হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহন করে। এইভাবে ভারতে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকে। মুসলিমশাসকরা শরিয়তের আইনের ভিত্তিতে উলেমাদের প্রভাবে যে শাসন প্রবর্তন করে, তা হিন্দুসম্প্রদায়ের নিকট ইসলামীয় শোষন বলে মনে হতে থাকে। মধ্যযুগে ভক্তিবাদ ও সুফিবাদের প্রভাবে কোন কোন শাসক পরধর্ম সহিষ্ণুতার নীতি অনুযায়ী শাসন পরিচালনা করলেও তা সামগ্রিক সাফল্য লাভ করেনি।

তাই ইংরেজরা যখন এদেশে মুসলিমদের কাছ থেকে শাসন ক্ষমতা দখল করে তখন ভারতীয় হিন্দু সম্প্রদায় এই রাজনৈতিক পরিবর্তনকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। বরং তারা ইংরেজদের সাহচর্যে এসে ইংরেজী ভাষা ও সংস্কৃতির পাঠ গ্রহন করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে সচেষ্ট হয়। অন্যদিকে ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় ইংরেহ শাসনের শুরু থেকে ইংরেজদের সঙ্গে দুরত্ব বজায় রেখে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি গ্রহন না করায় তারা অধুনিকতার ছোঁয়া পায়নি।

বৃটিশ সরকার ভারতীয় হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের এই বিভেদকে সু-কৌশলে কাজে লাগিয়ে ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে দীর্ঘস্থায়ী করতে সচেষ্ট হয়। আলিগড় আন্দোলন ও দেওবন্দ আন্দোলনের সুত্র ধরে ভারতে মুসলীম রাজনীতির চরিত্র পরিবর্তিত হয়। আলিগড় আন্দোলনের নেতা স্যার সৈয়দ আহমেদ হিন্দু মুসলিম দুটি পৃথক জাতি হিসাবে চিহ্নিত করে যে ‘দ্বি-জাতি তত্ত্বের’ অবতারনা করেছিলেন, তার থেকেই ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ ‘‘মুসলীম লীগ’’ গঠনের উৎসাহ পেয়েছিলেন। বৃটিশ সরকার ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ‘মর্লে - মিন্টো’’ সংস্কার আইন পাশ করে মুসলিমদের পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে উস্কানি দেয়, ফলে ভারতে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে চিড় ধরে।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে লখনৌচুক্তি স্বাক্ষরের ফলে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের মধ্যে বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে ভারতে হিন্দু-মুসলীম ঐক্যবদ্ধ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের বাতাবরন তৈরী হয়। এরপর খিলাফৎ আন্দোলনকালে গান্ধীজীর প্রচেষ্টায় খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলন ঐক্যবদ্ধ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে

পরিনত হয়। কিন্তু গান্ধিজী ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করলে এবং তুরস্কের কামালপাশা খলিফা পদ তুলে নিলে খিলাফৎ আন্দোলন গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে এবং ভারতে হিন্দু-মুসলীম সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার দুরত্ব বাড়তে থাকেএযুগে তানজিম ও তাবলিখ আন্দোলনের দ্বারা মুসলীমরা নিজেদের সংগঠন শক্তিশালী করতে সচেষ্ট হয়। এবং এসময় মুসলীমরা বেশী সাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠে। ১৯২৩-১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতে ৭২ টি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা ঘটে। এই সময়কালে চিত্তরঞ্জন দাস ''বেঙ্গল প্যাক্ট'' এর মাধ্যমে মুসলীম সম্প্রদায়কে জাতীয় আন্দোলনের মূলশ্রোতে ফেরানোর চেষ্টা করলেও ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুতে বাংলার মুসলিমরা আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে সাইমন কমিশনের বিরোধীতাকে কেন্দ্র করে মুসলীমলীগ প্রতিনিধিরা দুটি শ্রেনীতে ভাগ হয়ে পড়ে। মহম্মদ আলীজিন্না সাইমন কমিশন বর্জনের সিদ্ধান্ত নিলেও লীগের ''পাঞ্জাবীগোষ্ঠী'' লাহোরে মহম্মদ শফির সভাপতিত্বে সাইমন কমিশন গ্রহনের সিদ্ধান্ত নেয়। অর্থ্যাৎ লীগের মধ্যে ভাঙনের সম্ভবনা দেখা দেয়। এরপর ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে মতিলাল নেহেরুর ''নেহেরু রিপোর্ট'' প্রকাশ পেলে তাতে মুসলীম লীগের দাবী উপেক্ষিত হয়। ফলে সাইমন কমিশনের পর ভেঙে যাওয়া মুসলীমরা আবার সংঘবদ্ধ হয়। জিন্না মুসলীমদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য ১৪ দফা দাবী পেশ করে। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে , জিন্নার চৌদ্দদফা দাবী ঘোষনার পর থেকে রাজনৈতিক সংকট ও হিন্দু -মুসলীম ব্যবধান ক্রমশ বৃদ্ধি পায়।

আইন অমান্য আন্দোলন কালে অনেক মুসলীম জাতিয়তাবাদী দল, ''কংগ্রেস - মুসলিমদল'', '' খোদা-ই-খিদমৎগার'' প্রভৃতি সংগঠনের নাম এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। আইন অমান্য আন্দোলনের পরবর্তীতে ১৯৩৭ খ্রীঃ নির্বাচনে মুসলীমলীগ আশানুরুপ সাফল্য না করতে পারায় লীগ আরও সাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠে। লীগ উপলব্ধি করে তাদের জনপ্রিয়তা ধরে রাখতে এছাড়া কোন উপায় নেই। ১৯৪০ খ্রীঃ লীগের লাহোড় অধিবেশননে কৃষক প্রজা দলের নেতা ফজবুল হক যে ''পাকিস্থান প্রস্তাব'' উত্থাপন করে তা প্রথমদিকে কংগ্রেসের সংগে দরকষাকষির জন্য গৃহিত হলেও পরবর্তীকালে লীগ এই দাবী থেকে আর সরে আসতে পারেনি। এই দাবীকে বাস্তবায়িত করতেই ১৯৪৬ খ্রীঃ কলকাতা সহ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়।

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দ, ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা অনুযায়ী অন্তবর্তী সরকার গঠনে ভারতীয় কংগ্রেস ও মুসলীমলীগ সহমতে আসতে ব্যর্থ হয়। ফলস্বরুপ, লীগনেতা মহম্মদ আলি জিন্নার ডাকে ১৬ ই আগষ্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম (Direct Action) পালিত হয়। ঐদিন কলকাতা সহ বাংলা তথা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়।

একই সময় বাংলায় চলমান তেভাগা আন্দোলন ছিল কার্যত সাম্প্রদায়িকতামুক্ত। বাংলার প্রাদেশিক কৃষকসভা পরিচালিত এই আন্দোলন ছিল কৃষকদের স্বার্থরক্ষার আন্দোলন।দাঙ্গার পটভূমিতে তেভাগা আন্দোলন ছিল সম্প্রীতির উদাহরন।

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে কৃষকরা উৎপন্ন ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগ পাওয়ার দাবীতে তেভাগা আন্দোলন শুরু করে। তাদের এই দাবীর ভিত্তি ছিল ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশ। দীর্ঘদিন শোষিত কৃষকদের কথা চিন্তা করে বাংলা ফজলুল হক মন্ত্রীসভা এই কমিশন নিয়োগ করে। কিন্তু 'কৃষকদরদী নেতা' ফজলুল হক নিজেদের নিয়োজিত কমিশনের সুপারিশকে কার্যকর করার কোন চেষ্টা করেন না বরং বাংলাদেশের বিস্তীর্ন অঞ্চলে বর্গাপ্রথাকে আধাভাগের ভিত্তিতেই টিকিয়ে রাখতে সহায়তা করে। এমনকি, খুরাবর্দী সরকারের আমলে আইনসবায় উত্থাপিত ''বেঙ্গল বর্গাদারস্ টেমপোরারি রেগুলেশন বিল'' টিও ধানাচাপা দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে জ্যোতিবসু ''যতদুর মনে পড়ে'' গ্রন্থে লিখেছেন : ''আমি মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দীকে পরে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বিলটি ধামাচাপা দেওয়া হল কেন? উত্তরে সুরাবর্দী সাহেব আমাকে বলেছিলেন : 'আমি জানতামনা যে , আমার দলে এত জোতদার রয়েছে।' অর্থ্যাৎ জমিদারদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করেই এই বিলটি ধামাচাপা দেওয়া হয়েছিল।''

তেভাগা লড়াইয়ে বাংলার হিন্দু-মুসলমান ভাগচাষীরা এবং অন্যান্য নিপীড়িত কৃষক মিলিতভাবে হিন্দু-মুসলমান জমিদার জোতদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মিলিত হয়েছিল। জমির মালিক জোতদার শ্রেনী ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের দাঙ্গাকে তাদের স্বার্থে কাজে লাগাতে চেয়েছিল। তারা প্রচার করেছিল তেভাগার দাবী সাম্প্রদায়িক; তেভাগা বা অন্যান্য লড়াই চালালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধবে। তৎকালীন কংগ্রেস ও লীগ উভয় প্রতিষ্ঠানের দক্ষিনপন্থী মুখপাত্ররা তেভাগা দাবীকে সাম্প্রদায়িক দাবী বলে চিহ্নিত করেছিল। মুসলমান জোতদাররা হিন্দু কৃষকদের বিরুদ্ধে মুসলমান কৃষকদের এবং হিন্দু জোতদাররা মসুলমান কৃষকদের বিরুদ্ধে হিন্দু কৃষকদের উত্তেজিত করেছিল। হিন্দু-মুসলমান পুলিশ ও আমলারা একযোগে হিন্দু-মুসলমান কৃষকদের নির্যাতন করেছিল। লীগনেতা মওলানা আবদুল্লাহিল বাকী ও কংগ্রেসনেতা শ্রীযুক্ত নিশীতনাথ কুন্ডু দিনাজপুরে, মওলভী গিয়াসউদ্দিন পাঠান ও কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ধর ময়মনসিংহে, লীগনেতা আব্দুল জলিল ও কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ চক্রবর্তী যশোহরে একযোগে তেভাগার বিরোধীতা করেছিল।

তবে কংগ্রেস লীগনেতা ও জোতদারদের মিলিত ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বাংলার প্রাদেশিক কৃষকসভার নেতৃত্বে কৃষকরা দাঙ্গার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল। তেভাগার লড়াই দুর্ভিক্ষ ও দাঙ্গা বিধ্বস্ত মৃতপ্রায় বাংলায় ঐক্যের বাতাবরন সৃষ্টি করেছিল। তারা উপলব্ধি করেছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তাদের আন্দোলনকে বিপথে পরিচালিত করবে। তেভাগা লঠাইয়ের সময় কৃষকদের দাঙ্গা প্রতিরোধের অসংখ্য ঘটনা তার প্রমাণ।

তেভাগার লড়াইয়ে শহীদ তগনারারনের হত্যার প্রতিবাদে কৃষকসভার মিছিল ডিমলা ইউনিয়ন থেকে যখন ডোমারে পৌছয় তখন খবর আসে নীলফামারীতে দাঙ্গা শুরু হয়েছে। কৃষকরা নীলফামারী গিয়ে দাঙ্গা প্রতিরোধ করে। গ্রাম ও শহরবাসী কৃষক ও মধ্যবিত্তের মিলিত সভায় কৃষকনেতা দীনেশ লাহিড়ী তেভাগা আন্দোলনের সমর্থনে ও দাঙ্গার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেন। কৃষকরা শপথ নেয় দাঙ্গাবাজ জোতদারদের কাছে তারা মাথানত করবে না। ঢাকা জেলার বিক্রমপুর এলাকায় কুকুটিয়া ইউনিয়নে কৃষক সমিতি দাঙ্গা প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। কৃষক কর্মীরা স্থানীয় কৃষকনেতা শাহেদ আলীর নেতৃত্বে সিদ্ধান্ত নেয় - 'দাঙ্গা তেভাগার ক্ষতি করবে, তেভাগার শত্রুরাই দাঙ্গা সৃষ্টি করছে, দাঙ্গায় গরীবেরই সর্বনাশ, এ দাঙ্গা কিছুতেই ঘটতে দেওয়া যাবে না।'

এছাড়া ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের নোয়াখালী দাঙ্গার সময় পার্শ্ববর্তী এলাকা কুমিল্লার গ্রামাঞ্চলে দাঙ্গা প্রতিরোধ ইতিহাসে কৃষক সভার সংগ্রাম ছিল গৌরবময়। ঢাকা জেলার রায়পুরা থানা এলাকা সহ অসংখ্য জায়গায় দাঙ্গা প্রতিরোধে কষকদের প্রচেষ্টা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে।

অতএব এটা অনেকটাই স্পষ্ট যে, আন্দোলনে জোতদার, জমিদার, কংগ্রেস ও লীগ ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাকে শ্রেনীগত অস্ত্র হিসাবে করষকদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। অন্যদিকে কৃষকসভার নেতৃত্বে অধিকার ও বর্গাদার কৃষকরা হিন্দু-মুসলীম নির্বিশেষে সম্প্রীতি বজায় রেখে জোতদারদের ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করেছিল এটাই ছিল দাঙ্গার প্রেক্ষিতে তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস।তেভাগা আন্দোলনে সমাজের শোষিত ও নির্যাতিত হিন্দু-মুসলীম কৃষকশ্রেনীর ঐক্যবদ্ধ আন্দোন ভারতের স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে গণতান্ত্রিক আন্দোলন হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলায় দাঙ্গা মোকাবিলার ক্ষেত্রে তেভাগা আন্দোলন যে ভূমিকা পালন করেছিল তা জাতীয় আন্দোলনকেও আংশিক প্রভাব ফেলেছিল।

গ্রন্থঋণ (References)

মল্লিক, সমর কুমার, (১৯৯৬), আধুনিক ভারতের রুপান্তর রাজ থেকে স্বরাজ (১৮৫৭-১৯৪৭), কলিকাতা: ওয়েষ্ট বেঙ্গল পাব্লিসার্স।

হোর, সোমনাথ, তেভাগার ডায়েরী ও চা-বাগিচার কড়চা, পৃষ্ঠা নং ৩৪-৫৫, কলিকাতা সুবর্নরেখা।

উমর, বদরুদ্দিন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক, পৃষ্ঠা নং ৬১-৯০, কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশক প্রাইভেট লিমিটেড।

Sen, Sunil. Pheasant Movement in India-Mid nineteenth and Twentieth Centuries - 106 -118.

বন্ধোপাধ্যায়, সন্দীপ, ইতিহাসের দিকে ফিরে ছেচল্লিশের দাঙ্গা, পৃষ্ঠা নং ৩১-৪১, কলকাতা: ব্যাডিক্যাল ইমিগ্রেশন।